দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: ৪/৯/২০০৩ পৃঃ ৫

লক্ষ লক্ষ ফেল বনাম মানবসম্পদ উন্নয়ন

এ কে এম শাহজাহান

গত ১২ই জুন দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল সর্বমোট ৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৬ জন পাস করেছে এবং ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৮৩ জন ফেল করেছে। অর্থাৎ পাসের হার শতকরা ৪১.৫৮ এবং ফেলের হার ৫৮.২। পাস থেকে ফেল বেশী। ২৭শে আগষ্ট উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অবস্থা আরও খারাপ। সর্বমোট ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৯০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৩৪ জন পাস করেছে এবং ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৫৬ জন ফেল করেছে। অর্থাৎ পাসের হার শতকরা ৩৭.০৩ এবং ফেলের হার শতকরা ৬২.০৭। কোন কোন বৎসর পাসের হার একটু বেশী থাকে। তবে প্রতি বৎসরই যে এ দুই পরীক্ষায় লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ে ফেল করে থাকে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, কেন এ ফেল? শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ গড়া বা মানবসম্পদ উন্নয়নের মাপকাঠি কি পাস এবং ফেল বা ব্যর্থ হওয়া উচিত? কই! পৃথিবীর কোন উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তো 'ফেল বা ব্যর্থ' নামক শব্দটি ব্যবহার করে কোন ছেলে-মেয়েকে কলংকিত করা হয় না। সেখানে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া গুটিকতক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে দেশব্যাপী রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ মাধ্যম প্রভৃতিতে হৈ চৈ করা হয় না। এতদসত্ত্বেও তারা উন্নয়নের শিখরে গিয়ে পৌঁছেছে। আর আমরা মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া গুটিকতক অতি মেধাবী, কিছুসংখ্যক মেধাবী ও মাঝারি রকমের পাস ছাত্র-ছাত্রী এবং লক্ষ লক্ষ ফেল করা ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে একটি দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশ। এটাই কি তাহলে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ গড়ার লক্ষ্য? না, তা হতে পারে না এবং হওয়া উচিতও নয়। নিশ্চয় এটা ভাবনা-চিন্তার বিষয়। এজন্যই আজ এ লেখার উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। ৫৫ হাজার ৫ শত ৮৯ বর্গমাইলের এ ছোট্ট দেশটিতে প্রায় ১৩ কোটি লোক গাদাগাদি করে বাস করে। জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদ (কৃষি জমি, খনিজ তেল, বনজসম্পদ, কলকারখানা) একেবারেই অপ্রতুল। বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ অদক্ষ হওয়াতে তাদেরকে পুরাপুরি উৎপাদনমুখী এবং রফতানীযোগ্য পণ্য উৎপাদন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী বা মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে এ দেশের উন্নয়নকে এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব হতে পারে। এ অভিমত সকল অর্থনীতিবিদের এবং সকল উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের। দেশ উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার বা কৌশল হ'ল শিক্ষা এবং বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। সকল উন্নত দেশই এ কৌশল অবলম্বন করে তাদের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করেছে। কাগজে-কলমে বাংলাদেশও একই কৌশল অবলম্বন করেছে। তবে এ কৌশল বাস্তবায়নে তার সীমাবদ্ধতা প্রচুর। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাইমারী স্কুল থেকে বাদ পড়তে পড়তে যারা মাধ্যমিক স্কুলে আসে তাদের মধ্যে অনেকেই আবার মাধ্যমিক স্কুলের নিচের ক্লাসগুলোতে বাদ পড়ে যায়। বাদ পড়ার কারণ দারিদ্র্য, পারিবারিক সচেতনতার অভাব এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের ছেলে-মেয়েদের ধরে রাখার ব্যর্থতা। বাদ পড়া ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য বিয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এদের মধ্যে সামান্য একটি অংশ কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়া বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় নিম্ন মজুরীতে চাকরি গ্রহণ করে। বাদ পড়া ছেলেদের এক বিরাট অংশ বেকার ঘুরে বেড়ায় এবং বাকি অংশ কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়া কৃষি, কল-কারখানা, দোকান-পাটে বা বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাধারণ কোন কাজ বা কায়িক শ্রমের কাজে নিয়োজিত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন কাজ করার পর এদের অনেকেই হয়ত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু তা কোন অবস্থায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিকের সমমানের হতে পারে না। সেজন্য দেখা যায় উন্নত দেশের একজন রাজমিস্ত্রী, একজন কারিগর, একজন দর্জি বা অন্য কোন দক্ষ শ্রমিক কাজেকর্মে আমাদের দেশের একজন রাজমিস্ত্রী, একজন কারিগর বা একজন দর্জি থেকে বেশী দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। উন্নত দেশের একজন দক্ষ শ্রমিক মাপ ও নিখুঁত কলাকৌশল ব্যবহার করে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনে যেরূপ অবদান রাখে এদেশীয় দক্ষ শ্রমিকেরা তা পারে না। না পারার কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নিম্ন মান ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের অভাব। ইদানীং কিছু জেলা শহরে শ্রম ও জনশক্তি অধিদপ্তরের অধীনে দক্ষ শ্রমিক প্রশিক্ষণ এবং এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স চালু হয়েছে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও কিছু কিছু এনজিওও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ চালু করেছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এগুলো নগণ্য। যেসব ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত টিকে যায় এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, গড়ে তাদের মধ্যে অর্ধেকের চেয়েও বেশী ফেল করে। এ দেশের হাজার হাজার পরিবার আছে যারা ধার-কর্জ করে, জমি বন্ধক বা ঘরের প্রয়োজনীয় ধান-চাল বিক্রি করে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার খরচ বহন করে। এ অবস্থায় ফেলের মত দুঃসংবাদ যখন এসে পড়ে তখন পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের যে কি অবস্থা হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। ফেলের সংবাদ শুনে কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী আত্মহত্যার মত ঘটনাও ঘটায়। বেশীর ভাগই হয় মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত। ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবকেরা হন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এদের অনেকেই হয়ত দ্বিতীয়-তৃতীয়বারে পাস করে; কিন্তু এতে এদের জ্ঞানের পরিসীমা যে বেড়ে যায় তা কিন্তু নয়। মাঝখানে অভিভাবকবৃন্দ এবং রাষ্ট্র হয় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, শিক্ষার ব্যয় কিছু অভিভাবকবৃন্দ এবং কিছু রাষ্ট্র বহন করে। যদি এদেরকে মাধ্যমিক স্তর সমাপ্ত বা সমমানের একটি গ্রেড দিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হত তাহলে এরা দেশ উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ পেত। এতে সমাজ, রাষ্ট্র, অভিভাবকবৃন্দ এবং এরা নিজেরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হত। যেসব ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের সামান্য অংশই কারিগরি শিক্ষা বা পলিটেকনিক ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়। প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীর লক্ষ্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বিএ, এমএ বা ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের ভাল মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় শুধু পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরাও কলেজে ভর্তি হতে থাকে। অনেক অভিভাবক কলেজের দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার খরচ বহন করার ক্ষমতা না থাকলেও জমি বিক্রি বা বন্ধক বা ধার-কর্জ করে এ কাজটি করে থাকেন। এর পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়ানক। মাঝখানে অভিভাবকবৃন্দ হন ক্ষতিগ্রস্ত। আমাদের সমাজে বিএ, এমএ পাস করাকে পরিবারের জন্য সম্মানজনক বা গৌরবের বিষয় হিসাবে গণ্য হয় এবং দক্ষ শ্রমিক বা কারিগরি পেশাজীবী হওয়াকে হেয় চোখে দেখা হয়।

> *মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার বা কৌশল হ'ল শিক্ষা এবং বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। সকল উন্নত দেশই এ কৌশল অবলম্বন করে তাদের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করেছে। কাগজে-কলমে বাংলাদেশও একই কৌশল অবলম্বন করেছে। তবে এ কৌশল বাস্তবায়নে তার সীমাবদ্ধতা প্রচুর। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাইমারী স্কুল থেকে বাদ পড়তে পড়তে যারা মাধ্যমিক স্কুলে আসে তাদের মধ্যে অনেকেই আবার মাধ্যমিক স্কুলের নিচের ক্লাসগুলোতে বাদ পড়ে যায়। বাদ পড়ার কারণ দারিদ্র্য, পারিবারিক সচেতনতার অভাব এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের ছেলে-মেয়েদের ধরে রাখার ব্যর্থতা।*

আমাদের দেশের বিশৃংখল এ শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশির আমরা যদি উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই ভিন্ন এক চিত্র। সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সাজানো হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে উৎপাদনমুখী, বাস্তবধর্মী এবং সুন্দর ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন গড়ার উপযোগী। সেখানে একজন ছাত্র ও তার অভিভাবককে ফেলের মত দুঃসংবাদ শুনতে হয় না। উন্নত দেশগুলোতে এসএসসি ও এইচএসসি মানের সকল পরীক্ষা স্কুলে সমাপ্ত হয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজ নিজ মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী এ,বি,সি,ডি বা সমমানের গ্রেড পেয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে। এর পর নিচের গ্রেড (সি,ডি) পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা (তাদের সংখ্যা ৬০-৭০ ভাগ) তাদের পছন্দমত এবং যোগ্যতা বা গ্রেড অনুযায়ী ১,২,৩ বৎসর মেয়াদী ট্রেড ও পলিটেকনিক কোর্স বেছে নেয়। এরাই হয় মেকানিক, যন্ত্রচালক, কারিগর, ড্রাইভার, দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক, পোশাক প্রস্তুতকারক, দক্ষ কৃষি শ্রমিক, ফোরম্যান, নার্স, দক্ষ বিক্রয় কর্মী, সেক্রেটারী, টাইপিষ্ট, অফিস সহকারী, শিল্প-কারখানার দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি। শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সেবামূলক প্রভৃতি খাতের উন্নয়নে এ শ্রেণীর কারিগরি পেশার লোকের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। ঐ সব দেশে যারা ডি বা ঐ জাতীয় গ্রেড পায় তারা আমাদের দেশের ফেলের মতই। তবে তারা ফেল শব্দটি ব্যবহার করে ছেলে-মেয়েদেরকে হতাশ এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে দেয় না। তারা গবেষণা করে জানতে পেরেছে প্রকৃতিগতভাবে একটি জাতি ও সমাজে বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও মেধাসম্পন্ন ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ যেন মহান স্রষ্টার নিপুণ ও নিখুঁত এক কৌশল, যাতে এসব ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে একে অপরের প্রয়োজন মেটাতে বা উপকার করতে পারে। সকলেই যদি উচ্চ মেধাসম্পন্ন হয়, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে নির্মাণ শ্রমিক কে হবে, ক্ষৌরকার কে হবে, ড্রাইভার কে হবে, যন্ত্রচালক কে হবে, কৃষি কাজ করে করবে? এদেরকে বাদ দিলে জীবনযাত্রাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই দেখা যায়, যারা লেখাপড়ায় ভাল ফল করে না তাদের মধ্যে কেউবা কায়িক শ্রমযুক্ত নির্মাণ কাজে, কেউবা যন্ত্রচালনায়, কেউ মেরামতে, কেউ কৃষি কাজে, কেউ বিক্রয় কাজে ইত্যাদিতে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে যা উচ্চ শিক্ষিত কোন লোক দ্বারা সম্ভব হয় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদেরকে পরস্পর পরস্পরের বা একে অপরের প্রয়োজন মেটাতে বা উপকার করে যেতে হবে। এখানে কাউকে বা কারো কাজকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। ঐ সব দেশে কোন কাজকে হেয় করে দেখা হয় না। প্রকৃতিগতভাবে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মেধা ও প্রতিভার বিভিন্ন স্তর এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিভিন্ন পেশাভিত্তিক লোকের প্রয়োজনীয়তা, এ দু'টি সত্যকে সামনে রেখে তারা সকল ছেলে-মেয়ের জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিন্ডারগার্টেন, প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুলসহ বিভিন্ন ধরনের ট্রেড কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স, বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষাভিত্তিক কোর্সের ব্যবস্থা রেখেছে।

এতক্ষণ উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা হ'ল। এর সাথে তুলনা করলে বুঝা যায়, শিক্ষা বিস্তারে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে আমরা কোথায় আছি। বর্তমান সরকার ২০০১ সাল থেকে গ্রেড সিস্টেম চালু করে ক্ষতিকারক প্রতিযোগিতার বিলোপ সাধনসহ পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ও জবাবদিহিতা চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়াও নতুন একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে যা পরবর্তী সংসদে আলোচনা করার কথা। কিন্তু সকল ছেলে-মেয়েকে মৌলিক শিক্ষা প্রদান ও মানবসম্পদে রূপান্তরের জন্য আরও সংস্কার প্রয়োজন। বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এজন্য কিছু সুপারিশ করা হল।

প্রথমেই প্রাইমারী শিক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে যেসব শিশু স্কুলে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আসতে আসতে তাদের প্রায় ৪০ ভাগ বাদ পড়ে যায়। বাদ পড়ার কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৎসরের প্রথম থেকে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিশুদের অভিভাবকবৃন্দকে ডেকে একটি সভায় স্কুল কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে অভিভাবকবৃন্দকে সচেতন করে দেবেন। এ ধরনের সভা বৎসরে অন্ততঃ দু'বার হওয়া উচিত। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি, পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকবৃন্দের সচেতনতা বৃদ্ধিই এ ধরনের সভার লক্ষ্য। দরিদ্র শিশুদের উপস্থিতির হার কম হলে বা পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া অন্য কোন সমস্যা দেখা দিলে শিক্ষকবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে তাদের অভিভাবকবৃন্দের সাথে কথা বলে সমস্যার সমাধান করবেন। স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধি স্কুল থেকে শিশুদের বাদ পড়ার হার কমাতে সাহায্য করবে। প্রাইমারী শিক্ষাকে শক্তিশালী করার দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল শিক্ষকদের ভাল ও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ, তাদের জবাবদিহিতা এবং তাদের কাজের তদারকি। বর্তমানে প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ ১ বৎসর মেয়াদী একটি কোর্স। প্রাইমারী শিক্ষায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এটি আদৌ যথেষ্ট নয়। উন্নত দেশগুলোতে এটি ২/৩ বৎসর মেয়াদী কোর্স। একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের দেশে এটিকে এসএসসির পর ২ বৎসর পর্যন্ত করা যেতে পারে। প্রয়োজনে তাদেরকে এইচএসসি (শিক্ষা) সার্টিফিকেট দেওয়া যেতে পারে। এতে শিক্ষা বিষয়ে তাদের উচ্চতর শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ থাকবে। দীর্ঘমেয়াদী এ ব্যবস্থার পাশাপাশি যারা ইতিমধ্যে ১ বৎসর মেয়াদী কোর্স করে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রাইমারী শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক বিষয়ে উন্নত ও সঠিক পাঠদান পদ্ধতির উপর বাস্তবভিত্তিক ম্যানুয়েল তৈরী করে প্রত্যেক প্রাইমারী স্কুলে এক সেট ম্যানুয়েল সরবরাহ করা যেতে পারে। শিক্ষকেরা যাতে এ ম্যানুয়েল সঠিকভাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারে সেজন্য থানা শিক্ষা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে স্থানীয়ভাবে ৩/৫ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষককে এ সব ম্যানুয়েল ব্যবহারে সচেতন ও দক্ষ করে নেওয়া সম্ভব। এ ধরনের ম্যানুয়েলের ব্যবহার ও প্রয়োগ প্রাইমারী শিক্ষকদের দক্ষতা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি করবে। (চলবে)